সূ চি প ত্র

১১
নিশির ডাক

২৯
প্রদীপ

৫১
গুণিন

৬৩
টোকাই

৮২
অন্ধ মন্দির

ওভাবে খেতে দিয়েছে। তার সাহস আর অভ্যাস দুটোই ছিল। কিন্তু সে-দিন তার কপাল খারাপ ছিল বোধহয়। ওই জন্তুদুটো কাঁচা মাংসের দিকে ফিরেও তাকায়নি। বরং ওরা আক্রমণ করেছিল পান্নালালের ছেলেকে। ছেলের চিৎকার শুনে বাপ খাঁচার সামনে গিয়ে দেখে ততক্ষণে ওরা তার ছেলেকে ছিড়ে ফালাফালা করে মহানন্দে খাচ্ছে। রাগ সামলাতে না পেরে পান্নালাল ওই জন্তুদুটোকে গুলি করে মারে। তাদের গুলিবিদ্ধ দেহ পুঁতে দেয় ওই বাগানেরই মাটিতে। এরপর ওই বাগান ছেড়ে চলে যায় পান্নালাল। বাড়িটা খালিই পড়েছিল। ওর নাতির কাছে থেকে বেশ কয়েক বছর আগে ব্যাঙ্ক সেটা কিনে নেয়। তবে ওই জন্তুদুটোর বুকফাটা কান্নার শব্দ বা খিদের তাড়নার ডাকের শব্দ নাকি আজও শোনা যায় ওই বাড়িতে। আর শোনা যায় বাগান জুড়ে ওদের হাঁটাচলা করার শব্দ!'

"শ্রীধর গোস্বামী লম্বা একটা কাহিনি শোনালেন বটে কিন্তু তখনও আমি জানতাম না পান্নালাল কোন জন্তু আনিয়েছিল সার্কাসপার্টির চাহিদায়। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা শ্রীধরদা, সেই জন্তুগুলো কী ছিল? কাদের চিৎকার শুনে সকলের প্রাণ জল হয়ে যেত?'

"'হায়না!'

"এবার একটু ভয়-ভয় করল আমার। হায়না বাঘ বা সিংহর চেয়েও বেশি ভয়ংকর। এ অনেকেই জানে। ওদের খিদে পেলে সিংহকেও ছাড়ে না একা পেলে। সেখানে আবার হায়নার আত্মার কথা বলা হচ্ছে। যদিও শ্রীধরবাবু যেমন বলছেন, আজ একমাস হয়ে গেলেও তেমন কোনো শব্দই আমি শুনিনি। জানি না মণি শুনেছে কি না! ওকে জিজ্ঞেস করাও বৃথা। কারণ, ছেলেটা তো কথাই বলতে পারে না।

"গমগমে জনবহুল এলাকা থেকে আমার কোয়ার্টারটা একটু দূরেই ছিল। কাজেই সেখানে শেয়ালদের থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সাইকেল চালিয়ে ফিরতে-ফিরতে মনে হল এরপর শেয়ালকে না হায়না ভ্রম করি! বাড়ি এসে মণির হাতের তৈরি সুস্বাদু খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার খাটের দশ হাত দূরে একটা চৌকি ছিল, তাতে শুত মণি। সে-ও নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল আরাম করে। রাতে আমার ঘুম হল না। বাইরে কোনো শব্দ হলেই উঠে পড়ি আর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি। যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই। রাত তিনটে নাগাদ টিউবয়েল তলার দিক থেকে একটা খচ্‌খচ্‌ করে শব্দ হল। উঠে গিয়ে জানালায় চোখ রাখতেই দেখলাম প্রকাণ্ড দুটো শেয়াল সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। মনে-মনে খুব হাসি পেল। একা মানুষ পেলেই সকলে ভয় দেখানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। তা-ও যদি সেই হাঁসখালির নিশির মতো কিছু দেখতাম তবে একটা কথা ছিল। নিজের জায়গায় এসে আবার শুয়ে পড়লাম।

"পরের দিন লাঞ্চ আওয়ারের আগেই এল ফোনটা। মেজোপিসির ছেলে দিল্লি থেকে ফোন করে বলল, বাবার শরীরটা কাল রাত থেকে বেশ খারাপ করেছে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি যেন সেখানে চলে যাই।"

সুপ্রিয়দা গল্প থামিয়ে কিছু যেন একটা ভেবে নিলেন। গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে পাশের প্লেট থেকে এক টুকরো কাবাব তুলে আরাম করে চিবোলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "এখানে বলে রাখা ভালো, বাবা তখনও জীবিত ছিলেন। মা চলে যাওয়ার পরে বাবা পাকাপাকিভাবে দিল্লি চলে যান। ওখানে মেজোপিসি, ছোটোপিসি থাকতেন। আজও

থাকেন। আমি ট্রান্সফারেবল জবের কারণে যেতে পারিনি বাবার সঙ্গে। রিটায়ার করার পরে যদিও ইচ্ছে আছে দিল্লির বাড়িতেই চলে যাব। বাবা তা-ই চেয়েছিলেন সবসময়ই। যা-ই হোক, আমি অফিসে দিনসাতেকের ছুটির অ্যাপ্লিকেশন করলাম। বিকেলের মধ্যে মঞ্জুর হয়ে গেল আমার আর্জি। ঠিক করলাম পরের দিনই ভোরের ট্রেন বা বাস ধরে কলকাতা চলে যাব। সেখান থেকে এক এজেন্ট বন্ধুর মারফত ফ্লাইটের টিকিট কেটে দিল্লি পৌঁছে যাব সন্ধের মধ্যেই।

"সেদিন তাড়াতাড়ি কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। বাবার জন্য চিন্তা হচ্ছিল খুব। পিসির ছেলে বাবুকে বারবার ফোন করে খবর নিতে লাগলাম। ওরাও আমাকে আশ্বস্ত করতে লাগল নানাভাবে। রাতে তাসের আড্ডায় আর গেলাম না। ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। বাবা চেয়েছিলেন আমি সংসার করি, তাঁর সে আশা আমি পূর্ণ করিনি। এই নিয়ে বাবার আমার প্রতি একটা চাপা অভিমানও ছিল। রাতে সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে আনা খাসির মাংসে হাত লাগালাম না পর্যন্ত। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। মনে হল রান্নাঘরের দিক থেকে করুণ স্বরে কেউ কাঁদছে। খাট থেকে নেমে ঘরে আলো জ্বালাতেই দেখলাম মণির চৌকিটা ফাঁকা। কোনো কথা না বলে ধীরপায়ে এগিয়ে গেলাম রান্নাঘরের দিকে। সঙ্গে নিলাম আমার চিরসঙ্গী সেই পেনসিল-টর্চটা। রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতর আলো ফেলতেই আমি কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেখলাম মণি চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কুকুরের মতো দাঁড়িয়ে আছে; মাঝে-মাঝেই একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ করছে মুখ থেকে। মাটিতে পড়ে রয়েছে খাসির মাংসের বড়ো বাটিটা, তা থেকে বেরিয়ে

মাংসগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর মণি পশুর মতো ভঙ্গিতে সেগুলো মাটি থেকে মুখ দিয়ে তুলে-তুলে খাচ্ছে। তারপর হঠাৎ করেই ও সেই প্রাণ জল করা কান্নার সুরে একটা ডাক ছাড়ল। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল আমার। চুপচাপ ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। মন বলল আমি নিরাপদ নই। এই মণি নামের ছেলেটার কঠিন কোনো সমস্যা আছে। চুপ করে চাদর চাপা দিয়ে খাটে পড়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বেশ বুঝতে পারলাম মণি নিজের চৌকিতে এসে শুয়ে পড়ল। ও ওইভাবে কেন মাংস খাচ্ছিল কিছুতেই বুঝতে পারলাম আমি।

"ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। সকাল-সকাল কলকাতার একটা বাস পেয়ে গেলাম। কলকাতায় নেমেই দৌড়লাম সেই এজেন্ট বন্ধুর অফিসে। সে আমাকে দুপুরের একটা ফ্লাইটের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিল। সন্ধের মধ্যে পৌঁছে গেলাম দিল্লি। এয়ারপোর্টে নেমেই হাসপাতালে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি নিলাম। হাসপাতালে পৌঁছে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমি আর পিসতুতো ভাই বাবু। ডাক্তার বললেন, বাবার মাইল্ড একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই, এ-যাত্রায় উনি বেঁচে গেছেন। কয়েকটা মেডিসিন চলবে নিয়ম করে। তিনদিনের দিন বাবাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। বাবার হাবভাব দেখে মনে হল ওঁর কিছুই হয়নি। শুধু-শুধুই সকলে চিন্তা করছে। কোনো একটা জরুরি ব্যাপারে পরের দিন আমাকে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ফোন করলেন। আমাকে অবিলম্বে একবার ব্রাঞ্চে যেতেই হবে! কাজ শেষ করে আমি আবার ছুটি নিলে ব্যাঙ্কের কোনো আপত্তি নেই। বাবার কাছে অনুমতি নিলাম এ-বিষয়ে। বাবা বললেন, 'খোকা, চিন্তা

করিস না আমি ভালোই আছি। তবে তুই সাবধানে থাকিস, বাবা। আজকাল অনেক কিছু বুঝতে পারি, বুঝলি? আমি আর বেশিদিন নেই। তোরও একটা বিপদ হতে চলেছে। সাবধানে থাকিস।' বাবাকে এসব আজেবাজে কথা বলার জন্য কিছুটা বকুনি দিলাম। আমার কী বিপদ হতে চলেছে সেটা আর জানতে চাইলাম না। পরের দিন বিকেলে শিয়ালদা রাজধানীর একটা টিকিট পেয়ে গেলাম। ট্রেনে উঠতে যাব, ঠিক সেই মূহূর্তে দীনবন্ধুর ফোন এল আমার কাছে। দীনবন্ধু ফোনের ও-পারে হাঁফাচ্ছিল। ও বলছিল, মণি নাকি কেমন পশুদের মতো আচরণ করছে। একটু আগে দীনবন্ধু আমার খোঁজ নিতে আমার কোয়ার্টারে গেছিল, তখন নাকি মণি ওকে আক্রমণ করেছিল, ঘাড়ে কামড় বসাতে গেছিল। আমার মনে পড়ল সেই রাতের ঘটনা। আমি দীনবন্ধুকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, আমি ফিরে দেখছি।

"কোয়ার্টারে ঢুকে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম সবকিছু এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে এঁটোকাঁটা। কাচা মাংসের হাড়, মরা কাক আর পায়রার দেহাবশেষ পড়ে আছে যত্রতত্র। পড়ে আছে তাদের ঘিলু, নাড়িভুঁড়ি! ঘরে ভেতরে যা পচা গন্ধ বেরোচ্ছে তাতে পেটের ভাত উঠে আসতে চায়। অথচ মণি সবকিছু ঝকঝকে করে রাখত। কী হয়েছে ওর! সেই রাতেই বা অমন আচরণ করছিল কেন, তার পরেই বা কী হয়েছে এই ঘরে? মনের মধ্যে ভিড় করল হাজার প্রশ্ন। আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে ঢুকল দীনবন্ধু। নাকে হাত চাপা দিল ও বাধ্য হয়ে। ও খুব নীচুস্বরে বলল, 'মানিকপিরকে ডেকে আনি। তার জলপড়া আর তাবিজের গুণ অনেক।' আমি অমত করলাম না।

সে-ও দৌড়ে চলে গেল মানিক পিরকে ডাকতে। মানিকের মাজার কোয়ার্টার থেকে হাফ কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল। আমি ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরেও পেলাম অসহ্য পচা গন্ধ— চিড়িয়াখানার পশুদের খাঁচার বাইরে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়। রান্নাঘরে জানালা বন্ধ থাকার কারণে ভেতরটা অন্ধকার হয়েছিল। সেই অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতেই খেয়াল করলাম কুঁজো হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে কেমন যেন বেকায়দায় মাটিতে বসে আছে মণি। আমি ওকে ডাকলাম, 'মণি!' কেমন যেন একটা বিচিত্র শব্দ করল ও মুখ দিয়ে। সে শব্দ শুনলে হাড় হিম হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে চার হাত-পায়ে হেঁটে ও আমার সামনে চলে এল। আমি দেখতে পেলাম ওর চোখগুলো টকটকে লাল। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও সেকেন্ডের ভগ্নাংশে। সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকলেন মানিকপির। কিছু একটা পুটলিমতো মণির মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন তিনি। শান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও।

"মানিকপির সেই পুটলিটা একটা কালো সুতো দিয়ে মণির হাতে বেঁধে দিলেন। আমার হাতে একটা তামার গ্লাসে জল দিয়ে বললেন, 'এটা ওকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চামচে করে সামান্য খাইয়ে দেবেন। আজকের দিনটা কাটলেই আর চিন্তা নেই। সত্যিই রাতটা কাটল নির্বিঘ্নে। মনে হল ছেলেটার মধ্যে আর সেই পাশবিক ভাবটা নেই। আমি রিস্ক নিলাম না। পরের দিন ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করলাম। এবার আমার বেশ কিছুদিন ছুটি। প্রথমেই মণিকে কলকাতা নিয়ে এলাম। এখানে একটা প্রাইভেট হসপিটালের নিউরোলজি বিভাগের হেড ছিলেন আমার খুব কাছের এক বন্ধু। সে মণিকে পরীক্ষা করল। কয়েকদিন হাসপাতালে রাখল। তার পর আমাকে